01

নৈতিক অবক্ষয় : কারণ ও প্রতিকার

নৈতিকতা (ইংরেজি: Morality), যার অর্থ হলো ভদ্রতা, চরিত্র, উত্তম আচরণ। এটি মূলত উদ্দেশ্য,সিদ্ধান্ত এবং কর্মের মধ্যকার ভালো-খারাপ,উচিত-অনুচিত এর পার্থক্যকারী। নৈতিকতা হলো কোনো মানদন্ড বা নীতিমালা যা নির্দিষ্ট কোন আদর্শ, ধর্ম বা সংস্কৃতি থেকে আসতে পারে। আবার এটি সেসকল বিষয় হতেও আসতে পারে যেসকল বিষয়কে সমগ্র মানুষ কল্যাণকর হিসেবে আখ্যায়িত করে। নৈতিকতাকে "সঠিকতা" বা "ন্যায্যতা"-ও বলা যায়।

নৈতিকতার আদর্শে পরানীতিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, উক্তি, প্রবণতা এবং বিচারের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা-বিশ্লেষণ করা হয়। নৈতিকতার একটি আদর্শ উদাহরণ হলোঃ "আমাদের উচিত অন্যের সাথে সেভাবেই আচরণ করা যেমনটা আমরা নিজেরা অন্যের থেকে আশা করব।"

অপরদিকে, অনৈতিকতা হলো নৈতিকতারই সম্পূর্ণ বিপরীত। যা অসচেতনতা, অবিশ্বাস, উদাসীনতারই বহিঃপ্রকাশ।

নীতি বিদ্যা হলো দর্শনের সেই শাখা যেখানে নৈতিকতা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করা হয়। নীতি শব্দটি নৈতিকতারই সমার্থক শব্দ।অর্থাৎ নীতিবিদ্যা দ্বারা নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান বা বিদ্যাকে বোঝায়। ও নৈতিকতা যার অর্থ ভদ্রতা চরিত্র উত্তম আচারণ। এটি মূলত উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত এবং কর্মের মধ্যকার ভালো খারাপ উচিত-অনুচিত এর পার্থক্য কারী। নৈতিকতা হলো কোনো মানদণ্ড বা নীতিমালা যা নির্দিষ্ট কোন আদর্শ ধর্ম বা সংস্কৃতি থেকে আসতে পারে।

প্রযুক্তি যত সহজলভ্য হচ্ছে, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর ভালোবাসা ততই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের আচরণ দেখে সমাজের ছোট-বড় পার্থক্য করা আজ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। না আছে বড়দের সম্মান, না আছে শ্রদ্ধাবোধ। ফেসবুক খুললেই টাইমলাইনজুড়ে বড়দের নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে দেখা যায়। ঠুনকো বিষয় কেন্দ্র করে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদেরও নানা রকম নেতিবাচক মন্তব্যে জর্জরিত করা হয়। ‘আমিই সঠিক বুঝেছি; আমার উস্তাদগণ ভুল বুঝেছেন বা আমার বড়রা দ্বীন বোঝেননি, দ্বীনের দাবিগুলোর ব্যাপারে তাঁদের খবর নেই, তাঁদের মধ্যে দ্বীনের দরদ নেই’- এরকম একগুঁয়ে একটি মনোভাব বর্তমান উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে চরমভাবে জেঁকে বসেছে। দ্বীন ও উম্মাহর জন্য তাদের যেসব খেদমত ও অবদান সেগুলো স্বীকার করতে তারা যেন সঙ্কীর্ণতা বা কষ্ট অনুভব করছে।

অথচ বড়দের অগ্রাধিকার দিতে, শ্রদ্ধাবোধ আর সম্মান প্রদর্শন করতে আমাদের নবীজী সা: আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: হতে বর্ণিত- নবী করিম সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’ (আবু দাউদ-৪৮৪২)।

নবী করিম সা: বড়দের সম্মান প্রদর্শন না করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি বার্তা উচ্চারণ করার পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রেও বড়দের অগ্রাধিকার দিয়ে উম্মতকে দেখিয়ে গেছেন। বর্ণিত হয়েছে- 'কয়েকজন লোক একবার একটি হত্যা মামলা নিয়ে নবীজীর কাছে এসেছেন। নিহতের ছোট সন্তান আগ বেড়ে কথা বলতে চাইলে নবীজী সা: তাকে থামিয়ে বড় ভাইকে কথা বলার আদেশ দিলেন' (সুনানে আবু দাউদ-৬১৪২)।

নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা : জীবনে চলার পথে প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো নৈতিক মূল্যবোধ। আর একটি সুশৃঙ্খল সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ডাল-পালা মেললে অন্যায়, অপরাধ, অপসংস্কৃতি বেড়ে যাবে, এটিই স্বাভাবিক। তখন আর এ কথা বললে চলবে না যে, 'অবক্ষয়ের চোরা স্রোত বইয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে' বরং বলতে হবে 'চোরা স্রোত নয়, রীতিমতো বন্যার মতো অবক্ষয় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজটাকে।'

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ :

যৌবন আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত। এ সময় ব্যক্তি যা ইচ্ছা করতে পারে। কিন্তু সময়টি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তাই যৌবনের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুস্থ-সুন্দর কাজ করাই যুবকের দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, অসচ্ছলতার আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।' (মুস্তাদরাকে হাকিম) ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, 'আমি যৌবনকে এমন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করি, যা ক্ষণিকের জন্য আমার বগলের নিচে থেকে এরপর হারিয়ে যায়।'

যুবসমাজ ছাড়া সমাজ পরিবর্তন অসম্ভব। তাদের শক্তি ও ঐক্যের ওপর ভিত্তি করেই যেকোনো আন্দোলন সফলতার মুখ দেখে। তাই যে সমাজে যুবকদের চরিত্র ভালো থাকবে, সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক জীবন বিরাজমান থাকবে। বিপরীতে যুবকদের চরিত্র নষ্ট হলে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এখানে যুবসমাজের অধঃপতনের প্রধান কয়েকটি কারণ ও প্রতিকার তুলে ধরা হলো:

মাদকাসক্তি: মাদকে আসক্তি যুবসমাজকে অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গেছে। অথচ সব নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম। মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমরা মাদক গ্রহণ করবে না। কারণ তা সব অপকর্ম ও অশ্লীলতার চাবিকাঠি।' (ইবন মাজাহ) হাদিসে এসেছে, মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণির মানুষের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হলো—মদপানকারী, মদ প্রস্তুতকারী, মদ তৈরির উপদেষ্টা, মদ বহনকারী, যার কাছে বহন করা হয়, যে পান করায়, মদ বিক্রেতা, মূল্য গ্রহণকারী, মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং যার জন্য মদ কেনা হয়।' (তিরমিজি) তাই মদ ও সব নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকাই যুবসমাজের মুক্তির একান্ত পথ।

অশ্লীলতা: যুবসমাজ ভিনদেশি অশ্লীল সংস্কৃতির কোপানলে পড়ে তাদের চরিত্র হারাতে বসেছে। তাদের মেধা-মগজ সর্বদা সে দিকেই পড়ে থাকে। তাই তাদের এ অধঃপতন। আল্লাহ বলেন, 'আর যারা জুলুম করেছে, তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পোড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক

থাকবে না।' (সুরা হুদ: ১১৩)। মহানবী (সা.) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছেড়ে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন কোরো না।' (তিরমিজি)

অবাধ মেলামেশা: ইসলাম কখনোই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অনুমোদন করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবি পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। যার ফলে সে ব্যক্তির কুবাসনা সৃষ্টি হয়, যার অন্তরে আসক্তি আছে। তোমরা সংযত কথাবার্তা বলো।' (সুরা আহজাব: ৩২)

দুনিয়ার মোহ: মানবজীবন পরিচালনার জন্য ইহকালীন ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞান অর্জন করাই ফরজ। তবে যে জ্ঞানই অর্জন করি না কেন, তা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়। কিন্তু আজকের যুবসমাজ কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যেই জ্ঞানার্জন করার কারণে এবং অর্থ, নাম, খ্যাতির পেছনে দৌড়ানোর কারণে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যা দিয়ে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষা কেবল পার্থিব কোনো লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।' (আবু দাউদ)

অসৎ সঙ্গ: অসৎ বন্ধুর সঙ্গ মানুষকে প্রতারিত করে। কিন্তু প্রতারিত হওয়ার পর আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আল্লাহ বলেন, 'আর সেদিন জালিম নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে, হায়! আমি যদি রাসুলের সঙ্গে কোনো পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক।' (সুরা ফুরকান: ২৭-২৯)

যেসব কারণে যুবসমাজ অধঃপতিত হয়েছে তা যত তাড়াতাড়ি প্রতিহত করা যাবে, তত তাড়াতাড়ি যুবসমাজের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় সমাজ, দেশ ও জাতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নৈতিক অবক্ষয় রোধে করণীয়:

প্রযুক্তি যত সহজলভ্য হচ্ছে, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর ভালোবাসা ততই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের আচরণ দেখে সমাজের ছোট-বড় পার্থক্য করা আজ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। না আছে বড়দের সম্মান, না আছে শ্রদ্ধাবোধ। ফেসবুক খুললেই টাইমলাইনজুড়ে বড়দের নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে দেখা যায়। ঠুনকো বিষয় কেন্দ্র করে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদেরও নানা রকম নেতিবাচক মন্তব্যে জর্জরিত করা হয়। 'আমিই সঠিক বুঝেছি; আমার উস্তাদগণ ভুল বুঝেছেন বা আমার বড়রা দ্বীন বোঝেননি, দ্বীনের দাবিগুলোর ব্যাপারে তাঁদের খবর নেই, তাঁদের মধ্যে দ্বীনের দরদ নেই'- এরকম একগুঁয়ে একটি মনোভাব বর্তমান উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে চরমভাবে জেঁকে বসেছে। দ্বীন ও উম্মাহর জন্য তাদের যেসব খেদমত ও অবদান সেগুলো স্বীকার করতে তারা যেন সঙ্কীর্ণতা বা কষ্ট অনুভব করছে।

অথচ বড়দের অগ্রাধিকার দিতে, শ্রদ্ধাবোধ আর সম্মান প্রদর্শন করতে আমাদের নবীজী সা: আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: হতে বর্ণিত- নবী করিম সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' (আবু দাউদ-৪৮৪২)।

নবী করিম সা: বড়দের সম্মান প্রদর্শন না করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি বার্তা উচ্চারণ করার পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রেও বড়দের অগ্রাধিকার দিয়ে উম্মতকে দেখিয়ে গেছেন। বর্ণিত হয়েছে- 'কয়েকজন লোক একবার একটি হত্যা মামলা নিয়ে নবীজীর কাছে এসেছেন। নিহতের ছোট সন্তান আগ বেড়ে কথা বলতে চাইলে নবীজী সা: তাকে থামিয়ে বড় ভাইকে কথা বলার আদেশ দিলেন' (সুনানে আবু দাউদ-৬১৪২)।

নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা : জীবনে চলার পথে প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো নৈতিক মূল্যবোধ। আর একটি সুশৃঙ্খল সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ডাল-পালা মেললে অন্যায়, অপরাধ, অপসংস্কৃতি বেড়ে যাবে, এটিই স্বাভাবিক। তখন আর এ কথা বললে চলবে না যে, 'অবক্ষয়ের চোরা স্রোত বইয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে' বরং বলতে হবে 'চোরা স্রোত নয়, রীতিমতো বন্যার মতো অবক্ষয় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজটাকে।'

নবীনদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা : আজকের তরুণরাই জাতির আগামী দিনের কর্ণধার। বাস্তবিকভাবে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তরুণদের অবদান অনস্বীকার্য। পরিবার গঠন, উন্নয়ন ও সমাজের কল্যাণে কর্মময় জীবন ব্যয় করে একসময় তারা বার্ধক্যে উপনীত হন। তাদের বেড়ে ওঠা ও প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা নির্ভর করে। তাই তরুণ প্রজন্মকে এবং তার ভবিষ্যৎ ও নীতি-নৈতিকতা নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের প্রবীণদেরই ভাবতে হবে। প্রবীণদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা আর সযতœ পরিচর্যায় নবীনরা বেড়ে উঠলে আশা করি বড়দের প্রতি নেতিবাচক ধারণা জন্মানোর এ প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যাবে।

আর আমরা যারা ছোট আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যদি বড়দের সম্মান না দেই, তাহলে ছোটরাও আমাদের সম্মান দেবে না, এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। তাই সচেতন হতে হবে আপনাকে আমাকে। যার যার অবস্থান থেকে মানবিকতা, নৈতিকতা, নম্রতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন এবং ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবেই অন্যজন শিখবে। আমি অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করলে, তার বিনিময়ে আমিও ভালো ব্যবহার পাব। তাই আগে নিজেকে সচেতন হতে হবে, তারপর অন্যকে সচেতন করার কথা ভাবতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুক।

02

পারিবারিক কলহের কারণ ও প্রতিকারঃ

পরিবার মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকেই মানুষের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘর ও পরিবারকে তাঁর অন্যতম দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

'আল্লাহ তোমাদের ঘরকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪০) ঘর ও পরিবারকে মানুষের প্রকৃত আবাস ও আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলাম বহুমুখী নির্দেশনা দিয়েছে। যার মাধ্যমে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করা সম্ভব। আদর্শ মুসলিম পরিবারের কিছু বৈশিষ্ট্য হলোঃ

আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের প্রথম শর্ত আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন করা। স্ত্রী নির্বাচনে কোরআনের নির্দেশনা হলো—'তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (স্বামীহীন নারী) তাদের বিয়ে করো এবং তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা চার গুণ দেখে মেয়েদের বিয়ে করো : তার সম্পদের জন্য, তার বংশ পরিচয়ের জন্য, তার সৌন্দর্যের জন্য ও তার ধার্মিকতার জন্য। অতঃপর তুমি ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দাও। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : 4802)।

দ্বীনের চর্চা থাকাঃ

আদর্শ মুসলিম পরিবারে দ্বিনের চর্চা থাকবে। সেখানে ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুশাসন, আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতিপালন, কোরআন তিলাওয়াত ও জিকির এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের চর্চা থাকবে। তাদের জীবনযাপনে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হবে। আল্লাহ বলেন,

'আমি মুসা ও তার ভাইয়ের প্রতি প্রত্যাদেশ দিলাম—মিসরে তোমার সম্প্রদায়ের জন্য ঘর নির্মাণ করো। তোমাদের ঘরগুলোকে 'ইবাদতখানা' করো, তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৮

ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করাঃ

আদর্শ মুসলিম পরিবার তাদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করবে। কোনো কারণে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো সম্ভব না হলে, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় (ফরজ) ধর্মীয় জ্ঞান যেন শিশুরা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের জন্য ফরজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'(ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪) ইসলামী পঠনসামগ্রী থাকা আদর্শ ইসলামী পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষার ওপর নির্ভর করবে না; বরং পরিবারে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করবে।যাতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের পাশাপাশি কোরআন ও হাদিসের

ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্যবিষয়ক বই থাকবে। শিশুদের ইসলামী সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত করে তুলবে। বর্ণিত আছে, 'জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। যখন সে তা পায় সংরক্ষণ করে এবং অপর হারানো বস্তুর অনুসন্ধান করে।

পাপ ও পাপ উপকরণমুক্ত হওয়াঃ

পাপ ও পাপের উপকরণ থেকে মুক্ত থাকবে আদর্শ মুসলিম পরিবার। কেননা পাপের উপকরণ পাপ কাজে উৎসাহিত করে। আর পাপ পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট করে। এমনকি কোনো ভালো উপকরণের মন্দ ব্যবহার বেশি হলেও তা পরিবার থেকে দূরে রাখবে। আর যে উপকরণের মন্দ ব্যবহারই বেশি তা অবশ্যই পরিহার করবে। ভালো ও মন্দ জিনিসের ব্যবহার বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদিস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যেতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত আতর বিক্রেতা ও কামারের হাপরের মতো। আতর বিক্রেতার কাছ থেকে হয়তো তুমি আতর কিনবে বা তার সুঘ্রাণ পাবে।আর কামারের হাপর তোমার শরীর বা কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২১০১)। আবদুর রহমান হাসান জানকা বলেন, 'ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ও দ্রোহের আগুন নেভাতে শিকড় থেকে চরিত্র সংশোধন করতে হবে। কেননা পাপে মত্ত ব্যক্তিরাই পরিবার ও আপনজন থেকে দূরে সরে যেতে চায়। পাপ তার ভেতর অস্থিরতা দূর করে।'

সময়ের শৃংখলাঃ সময়ের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আদর্শ পরিবারের জন্য অপরিহার্য। বিশেষত পরিবারের নামাজ, ইবাদত ও দ্বিনি জ্ঞানচর্চায় সময়ের শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাজের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীত হয়ে দাঁড়াও।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৮)
এ ছাড়া শিশুদের পড়ালেখা, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা ও ঘুম ইত্যাদি যেন সময়মতো হয় তাও লক্ষ রাখতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,কিয়ামতের দিন কোনো বান্দা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে জীবন (সময়) কোথায় ব্যয় করেছে, জ্ঞান কী কাজে লাগিয়েছে, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে এবং শরীর কোথায় উন্মুক্ত করেছে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৭)

গোপনীয়তা রক্ষাঃ

পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা আদর্শ মুসলিম পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটা শুধু দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা নয়; বরং অন্যান্য বিষয়েও গোপনীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। পারিবারিক কলহ-বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি তুলে ধরে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামী) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রী) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৫)।এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পারিবারিক জীবনে কোনো সংকট দেখা দিলে তা নিজেদের মধ্যে গোপন রাখবে এবং নিজেরাই তার সমাধান করবে।

পরস্পরকে সহযোগিতাঃ

সাংসারিক কাজে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। কারো ওপর নির্ভর করে থাকবে না। শিশুদেরও ছোট থেকে স্বনির্ভর হতে শেখাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) পারিবারিক কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। পারিবারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা আল্লাহ ভালোবাসেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তাতে মমতা ও ভালোবাসা দান করেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৫৯৩)।

পর্দা ও শালীনতাঃ

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শালীনভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছে। তবে নারীর প্রতি যেহেতু পুরুষের আকর্ষণ অনেক বেশি প্রবল তাই নারীকে নারীসুলভ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছে। অশ্লীল পোশাক ও চালচলন পরিহার করতে বলেছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা ঘরে অবস্থান করো এবং জাহেলি (বর্বর) যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করো না।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৩৩)।ধু বাইরে নয়; বরং ঘরেও নারী-পুরুষ উভয়কে শালীনভাবে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা সুরা নুরের ৩১ ও ৫৮-৫৯ নম্বর আয়াতে বুঝমান শিশুর সামনে শালীন পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে। শালীনতা নষ্ট হয় এমন সময় (ফজরের আগে, দুপুরে বিশ্রামের সময় ও এশার পর) ঘরে প্রবেশের আগে তাদের অনুমতি নিতে বলা হয়েছে।

পারিবারিক কলহের কারণঃ

- নৈতিক শিক্ষার অভাবঃ
- মূল্যবোধের অভাবঃ
- অর্থনৈতিক কারণঃ
- প্রযুক্তির কারণেঃ

অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তির কারণেও পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন—মোবাইল ফোন, ফেসবুক ও টুইটার নিয়ে মানুষ খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পরিবারের সদস্যরা একে অন্যকে যে পরিমাণ সময় দেওয়া উচিত তা দিতে পারছে না। ফলে পারিবারিক বন্ধন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে।

- আত্নকেন্দ্রিক মনোভাবঃ

  আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণে অবিশ্বাস, হতাশা, লোভ ও মানসিক বিষণ্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশগত কারণ
- জমিজমা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে কলহ
- পরকীয়া
- অভিযোগ প্রবনতা
- পারস্পরিক অসম্মান প্রদর্শন
- অসহনশীলতা

- সামাজিক জটিলতা
- ফেসবুকের মাত্রাহীন ব্যবহার
- মিথ্যা সন্দেহের তীর
- অপসংস্কৃতি
- মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্যের সাথে নিজেদের জড়ানো
- ধৈর্য্যহীনতা

প্রতিকারঃ

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ

বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একটি চিত্র চোখের সামনে বারবার দেখতে পাচ্ছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামী কিংবা স্ত্রী সন্তানকে মেরে ফেলছে। মা সন্তানকে হত্যা করছে এবং নিজেরা আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন, বর্তমানে অতিরিক্ত মাত্রায় এই ঘটনাগুলো ঘটছে। এ থেকে অবশ্যই উত্তরণের পথ আছে। বিশ্বাস করি অর্থনৈতিক সমস্যা সবচেয়ে জটিল সমস্যা কিন্তু ঘরে বাইরে দুজন যদি এ থেকে বের হবার পথ খুঁজে বেড়াই তবে কোনো না কোনো পথ অবশ্যই বের করা যাবে। এখানে হত্যার বা আত্মহত্যার মতো নৃশংস সিদ্ধান্ত কেন? সত্যিকার অর্থে যখন যেমন তখন যদি সেরকম ভাবে আমরা পারিবারিক অর্থনৈতিক চাকা ঘুরানোর চেষ্টা করি তবে অনেকাংশে মনের অশান্তি কমে যাবে বলে মনে করি।

(২) কাজের চাপঃ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় প্রতিনিয়ত আমরা অফিস, বাসাবাড়িতে আমাদের আওতায় যারা কাজ করছে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে, চিৎকার করি, অফিসের সময় এর বাইরেও বিভিন্নভাবে কাজের ছুতোয় আটকে রাখি ওই ব্যক্তি তখন ধীরে ধীরে পরিবারের কাছ থেকে দূরে চলে আসে। আমার ক্ষমতা থাকা মানে অফিসের বড় কর্তারা-সকলেই সারাদিন চিৎকার করতে পারি না, নিজেকে জাহির করার জন্য অন্যের পরিবার ভাঙতে পারি না। অফিস পাড়ার খারাপ ব্যবহার পারিবারিক অশান্তির খুব বড় একটা কারণ।(

(৩)সাবধানতার সাথে ভার্চুয়াল জগতের ব্যবহারঃ

ভার্চুয়াল জগতে অনেকে আবার জড়িয়ে পড়েন পরকীয়ার মতো ভয়ংকর ঘটনায়। সাবধানতার সাথে ভার্চুয়াল জগতের ব্যবহার করতে হবে।

(৪) সন্দেহ দুরীকরণঃ

সন্দেহ একটি জটিল রোগ। প্রতিটি মানুষকে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। কে বন্ধু, কে ভাই, কে বোন, কে অফিসের বস। সবক্ষেত্রেই সম্পর্কের ধরণ আলাদা।

(৫) পারিবারিক বিনোদনঃ

পারিবারিক পরিমন্ডলে গান হাসি ঠাট্টা করা, বই পড়া সমস্তটাই ভুলতে বসেছি। অপসংস্কৃতি জাগ্রত হয়েছে। নিজেদেরকে ও সংস্কৃতির মধ্যে থাকতে হবে দেশীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে হবে এবং শিশুদের দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে, তবেই পরিবার সুখী পরিবার।

(৬) পরিবারকে সময় দেয়াঃ

অনেক ক্ষেত্রেই সবাইকে বলতে শোনা যায় পরিবারের সঙ্গে মূল্যবান সময় কাটানোর সময় কোথায়? কিন্তু পারিবারিক অনুপ্রেরণার ফলে ওই মানুষটি আরো উৎফুল্ল হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ নিজ করতে পারবেন। তার মনের এই প্রফুল্লতা পারিবারিক জীবনে সুখী হতে সাহায্য করবে।

(৭) পারস্পরিক বোঝাপড়াও ভালোবাসাঃ

অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে যেমন শ্বশুর-শাশুড়ি ভাই, বোন, মা বাবা, খালা যেকোনো ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আবির্ভাব ঘটতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তির মাথাচাড়া ভাব নির্মূল ঘটাতে পরস্পরের বোঝাপড়াও ভালোবাসার খুব প্রয়োজন।

(৮) যৌতুক প্রথার নিরসনঃ

এ যুগেও যৌতুক পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদ অন্যতম কারণ। অবাক করা বিষয়, যৌতুক মানে তো অন্যের সম্পত্তি জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া, এটি ডাকাতি কিংবা ছিনতাইয়ের শামিল।

(৯) নৈতিক শিক্ষার প্রসারঃ

(১০) সহনশীলতা

(১১) ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করাঃ

(১২) পারিবারিক বন্ধনের উপর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ইন্সটিটিউট গঠন করা

(১৩) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণাঃ

(১৪) পারিবারিক সম্প্রীতির বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্তকরণঃ

(১৫) পরিবারের ছোটবড় সবার মাঝেই আদবকায়দা ও নম্রতার চর্চাঃ

(১৬) ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও প্রয়োগ

(১৭) ইলেক্টনিক ডিভাইসের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক কলহ আমাদের ফুলের মত সুন্দর জীবনটাকে আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছারখার করে দেয়, তাই নিজেকে ও পারিবারিক বন্ধনকে অক্ষত রাখতে হলে কলহকে থেকে দূরে থাকি।আমরা যদি পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকতে পারলেই সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার বাঁচবে, আর তা তাহলেই আগামী প্রজন্ম সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারবে। আর সেজন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন ও দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন।

03

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনকে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করেছেন। পারিবারিক জীবনে সন্তান-সন্ততি কত বড় নিয়ামত তা যার সন্তান হয়নি তিনি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে থাকেন। যাদেরকে আল্লাহ রাববুল আলামীন সন্তান দান করেছেন তাদের উপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পিতা-মাতার জন্য সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হবে যদি সন্তানকে আদর্শবান রূপে গড়ে না তুলতে পারেন। কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ".

"প্রতিটি নবজাতক তার স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।" [সহীহ বুখারী: ১৩৫৮]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন যেভাবে অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা এবং চরিত্র বিধ্বংসী কাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের সন্তানের উপর যেসব দায়িত্ব আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সন্তানকে লালন-পালন করা ঈমানের অন্যতম দাবী।

জগত সংসারে মানুষের প্রিয়তম বস্তু ও হৃদয়ের অন্যতম আনন্দ যেমন সন্তান-সন্তানাদি, আখেরাতের জীবনেও তেমনি মানুষের সাথী ও আনন্দ এই সন্তান-সন্তানাদি। কুরআন কারীমে একাধিক স্থানেঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতে মুমিনগণ তাদের সন্তানদের সাহচর্য উপভোগ করবেন।আল্লাহ তাআলা বলেন,

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্তানাদি যারা ইমানের বিষয়ে তাদের অনুগামী হয়েছে, তাদের সন্তান-সন্তানাদিকে তাদের সাথে মিলিত করাব এবং তাদের কর্মফল কিছু কম করা হবে না। (সুরা তুর- ২১)

সন্তানদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের আনন্দের উৎস বানাতে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য কুরআন ও হাদীসে সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশেষরুপে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রাথমিক দায়িত্বগুলোর অন্যতম হলো-

কানে আযান দেয়া

সন্তান দুনিয়াতে আসার পর গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আযান দেয়া, তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। এটি পিতা-মাতার উপর এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বযে, শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ পৌঁছে দেয়া এবং ওত পেতে থাকা শয়তান যাতে তার কোন ক্ষতি না করতে পারে। হাদিসে এসেছে,

আবূ রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসান ইবনে আলীর কানে আযান দিতে দেখেছি।" [সুনান আবূ দাউদ:৫১০৫]

তাহনিক করা ও নাম রাখা

আমাদের সমাজে সন্তানদের "ভাতমুখে" দেওয়ার রীতি আছে। তা ইসলামী রীতি নয়। ইসলামে যে রীতি নবী (সা.) প্রচলন করেছেন তা হলো নবজাতক শিশুর জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে কোনো নেককার বুজুর্গের (দাদা, দাদি, নানা, নানি, ইমাম) নিকটে নিয়ে শিশুর মুখের মধ্যে চিবানো খেজুর বা মধু বা অনুরূপ কোনো মিষ্টি খাদ্য দ্রব্য ছোঁয়ানো। একে তাহনীক বলা হয়। সাহাবী আবু মুসা আশ-আরী রা. বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মালে আমি তাকে নিয়ে নাবী (সা.) এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম। অতপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। (সহীহ বুখারী হা- ৭১/১-৫৪৬৭)

এছাড়াও বাচ্চার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাম অর্থবহ হওয়া নামের সৌন্দর্য। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকঅসুন্দরনামপরিবর্তনকরেদিয়েছিলেন।" [আবুদাউদ৪৯৫২-৪৯৬১]

আকিকা করা

জন্মের ৭ম দিনে নবজাতকের শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, চুল কাটা, চুলের ওজনের সমপরিমাণ রৌপ্য দান করা এবং তার পক্ষ হতে মেষ বা ছাগল আকিকা হিসেবে জবেহ করা। কেননা- নবী (সা.) বলেছেন,

প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস- ২১/২৮৩৮)

উম্মে কুরয রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আকিকা ছেলের পক্ষ থেকে সমবয়স্ক দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী জবেহ করতে হবে। (সুনানে আবুদাউদ হাদিস- ২১/২৮৩৬) নবজাতক ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে একটি করে বকরী আকীকা করা যাবে।

সাহাবী ইবনু আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান ও হুসাইন রা. পক্ষ থেকে একটি করে বকরী আকীকা করেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস- ২১/২৮৪১)

সাদকাহ করা

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সপ্তম দিবসে চুল কাটা এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ করা সুন্নাত।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা. এর পক্ষ থেকে ১টি বকরী আকীকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা ! তার মাথা মুণ্ডন কর এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ কর।" [সুনান আত-তিরমিযী: ১৫১৯] এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শিশুদেরকে খেজুর দিয়ে তাহনীক এবং বরকতের জন্য দো'আ করতেন।" [সহীহ বুখারী: ৩৯০৯; মুসলিম: ২১৪৬]

দুধপান করানো

মাতার ওপর দায়িত্ব হলো দু' বছর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো। আর পিতার দায়িত্ব হলো মাতার জন্য এরূপ দুগ্ধদানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। ছয় মাস বয়স থেকেই শিশুকে অন্যান্য (শক্ত ও নরম মিশ্রিত) খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত করতে হবে যেন দু'বছরের মধ্যে তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যায়, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যে সকল মায়েরা, দুধপান করানোর সময়টি পূর্ণ করতে চায়, তারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর বুকের দুধ খাওয়াবে আর পিতার ওপর দায়িত্ব হলো যথাবিধি তাদের (মা ও শিশুর) ভরণপোষণ করা।" (সূরা বাকারা- ২৩৩)

তাওহীদ শিক্ষা দেয়া

শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর তাওহীদ শিক্ষা দতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন:

"হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাতে চাই। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, আল্লাহও তোমার হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, তুমি তাঁকে সর্বদা সামনে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সহযোগিতা চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলমের লিখা শেষ হয়েছে এবং কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।" [তিরমিযী: ২৫১৬]

কুরআন শিক্ষা দান

ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও। তন্মধ্যে রয়েছে তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা ও কুরআনের জ্ঞান দাও।" কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:**خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ**

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।"

সালাত শিক্ষা দেয়া ও সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করা

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যে পিতা-মাতা তার সন্তানকে সলাত শিক্ষা দিবেন এবং সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন। হাদীসে এসেছে: "আমর ইবনে শূয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাবা তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সলাতের নির্দেশ দাও সাত বছর বয়সে। আর দশ বছর বয়সে সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং শোয়ার স্থানে ভিন্নতা আনো।" [সুনান আবূ দাউদ: ৪৯৫]

আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া "সন্তানদের আচরণ শিক্ষা দেয়া পিতামাতার উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত। লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বললেনঃ

'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।" [সূরা লুকমান ১৮,১৯]

আদর স্নেহ ও ভালবাসা দেয়া:

সন্তানদেরকে স্নেহ করা এবং তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন দিলেন এবং আদর করলেন। সে সময় আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমারতো দশটি সন্তান কিন্তু আমিতো কখনো আমার সন্তানদেরকে আদর স্নেহ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে অন্যের প্রতি রহম করে না আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না।" [সহীহ বুখারী: ৫৯৯৭]

দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া:

সন্তানকে দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া ফরজ করা হয়েছে। কারণ দ্বীনি ইলম না জানা থাকলে সে বিভ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। হাদীসে এসেছে: "আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।" [সুনান ইবন মাজাহ: ২২৪

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমারা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (সূরা তাহরীম- ৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের সন্তানদের বয়স ৭ বছর হলে তাদেরকে নামাজ আদায়ের আদেশ কর। আর ১০ বছর বয়স হলে তাদেরকে শাসন করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে।" (সুনানে আবু দাউদ- ১/১৩৩)

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা

সন্তানদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত লালন-পালন করতে হবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে হবে। "উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আবূ সালামার সন্তানদের জন্য আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯]

শক্তিশালী করে গড়ে তোলাঃ

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হলো তাদেরকে শক্তিশালী রূপে গড়তে হবে। ঈমানের শক্তি, মনের শক্তি, দেহের শক্তি সকল দিক থেকেই শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দূর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও প্রিয়তর। (সহীহ মুসলিম-

সন্তানদেরকে এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে তোলা,তারা যেন উপার্জন করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন:

"তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও সাবলম্বি রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।" [সহীহ বুখারী:১২৯৫]

খেলাধুলাঃ

সন্তানদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও শক্তি অর্জনের জন্য তাদের শরীর চর্চামূলক খেলাধুলা করাতে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ, সাঁতার ইত্যাদি খেলাধুলা বিশেষভাবে নবী (সা.) ও সাহাবীগণ করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, হাবশীগণ (ইথিওপিয়াবাসী) লাঠি, বল্লম, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলা করছিল। উমর (রা.) তাদের এই খেলায় আপত্তি করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "উমর! তুমি ওদের খেলতে দাও।" এরপর নবী (সা.) ক্রীড়ায়তদেরকে বলেন, "হে হাবশিগণ! তোমরা খেল, যেন ইহুদি খ্রিস্ট্রানরা জানতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে প্রশস্ততা আছে। আমি প্রশস্ত দ্বীনে ন্যায়বরণকারীসহ প্রেরিত হয়েছি।" (সহীহ বুখারী- ১/৩২৩, ৩৩৫, সহীহ মুসলিম- ২/৬০৯)

সাহাবি উকবা বিন আমীর (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং ঘোড়ায় আরোহণ কর, ঘোড়ায় আরোহণ করার চেয়ে তীর নিক্ষেপ করা আমার নিকট বেশি প্রিয়। (সুনানে তিরমিযী- ২/১৭৪, সুনানে নাসায়ী- ৬/২২২)

আনাস রা. বলেন, সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্নেহ, দয়া ও মমতা করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে বেশি কাউকে আমি দেখিনি। (সহীহ মুসলিম- ৪/১৮০৮)

বিবাহ কার্য সম্পাদন করা:

বর্তমানে আমাদের সমাজে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদেরকে সমাজের উঁচু অবস্থানে পৌঁছানোর অযুহাত দেখিয়ে অভিভাবকগণ তাদের নিজ সন্তানদের বিবাহ কার্য সম্পাদন করান না। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

আবু সাঈদ ও ইবনু আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির কোনো সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে, আর উত্তম আচার-আচরণ শিক্ষা দেয় এবং যখন সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যেন বিয়ে দেয়। বয়ঃপ্রপ্তির পর যদি বিয়ে না দেয় এবং ঐ সন্তান যদি কোনো পাপ করে (ব্যাভিচারের মত পাপ করে) তবে ঐ পাপের বোঝা পিতার উপর বর্তাবে। (মিশকাত- ১৩/৩১৩৮)

অতএব সন্তানদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে যথা সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানোর প্রতি মনোনিবেশ করা ফরজে আইন বা সার্বজনীন ফরজ।

সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা:

স্নেহ-মমতা, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সকল সন্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে। কোনো সন্তানকে অন্যান্য সন্তান থেকে পৃথকভাবে অতিরিক্ত স্নেহ করা বা পুত্রদের বেশি স্নেহ আর কন্যাদের কম স্নেহ করা ইসলামে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

নো'মান ইবনু বাশীর রা. বলেন, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বলেন, আমি আমার ছেলেকে একটি খাদেম দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমার সকল সন্তানকেই কি তুমি এরুপ দান করেছো? তিনি বলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এটি ফিরিয়ে নাও। (সহীহ মুসলিম- ৩/১২৪১-৪২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখবে।" (সুনানে আবু দাউদ- ৩/২৯৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেন

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তাদের মাঝে ইনসাফ করো।" [সহীহ বুখারী: ২৫৮৭]

ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে বিরত রাখা:

ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত না রাখলে এই সন্তানগনই কিয়ামাতে পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কুরআনে এসেছে: "হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা আত-তাহরীম-৬]

"আর কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের রব, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" [সূরা হা-মীম আসসিজদাহ-২৯]

পাপকাজ, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা :

সন্তান দুনিয়ার আসার সাথে সাথে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুপে,পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে, বিভিন্ন ফ্যাশনে, বিভিন্ন ডিজাইনে, বিভিন্ন শিক্ষার নামে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তাই পিতা-মাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন:

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।" [সূরা তাগাবুন-১৪]

হাদীসে এসেছে, ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "রাসূলে করীম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।" [সহীহ বুখারী:৫৮৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।" [সুনান আবূ দাউদ:৪০৩১]

দো'আ করা:

আমাদের সন্তানদের জন্য দো'আ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে,

আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা বলে "হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।" [সূরা আলফুরকান-৭৪]

সামাজিকতার শিক্ষা দেওয়া:

অন্যদের সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয় তা শেখান। শিশুরা খেলার সময় কোন সমস্যায় পড়লে তা তাদের সমাধান করতে দিন। অন্যের মতের প্রতি কীভাবে সম্মান দেখাতে হয় তা শিক্ষা দিন।

প্রশংসা করা: যে কোন ভালো কাজের জন্যে তার প্রশংসা করুন, তা যতই ছোট হোক। খারাপ কাজের জন্যে কখনো বকা দেবেন না, বুঝিয়ে বলুন কাজটি কীভাবে করা উচিৎ ছিল।অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী কলহের চাপে অনেক শিশুর স্বাভাবিক জীবনই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছে। পিতামাতার বচসা-ভুল বোঝাবুঝির ঘটনায় শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেসব শিশু মা-বাবার মনোমালিন্য দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে, তার হতাশ অসামাজিক ও সহিংস হয়ে ওঠে। না অনিশ্চয়তায় ভুগতে থাকে। তাদের মধ্যে এক অস্থিরতা তৈরি হয়। ফলে মনোসংযোগের ঘাটতিও দেখা দেয়। প্রতিদিন পিতা-মাতার বিবাদের প্রত্যক্ষদর্শী বহু শিশুর মধ্যে পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতাও দেখা যায়। সমাজে মানিয়ে চলতে অসুবিধা হয় তাদের। গর্ভকালে যেসব মাতা নির্যাতনের শিকার হয়া কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন, তাদের সন্তানও জন্মের পর নানা প্রতিকূলতায় ভোগে।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য এক জরিপে দেশে পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ মানসিক রোগে আক্রান্ত। এমন ঘটনা আবার মেয়েশিশুর তুলনায় ছেলেশিশুর মধ্যে বেশি। মেয়েশিশুদের ১৭ দশমিক ৪৭ শতাংশের পাশাপাশি ১৯ দশমিক ২১ শতাংশ ছেলেশিশু মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক হেলালউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শিশুদের ওপর মানসিক আঘাতের প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষতিকর। যেকোনো ধরনের অনাকাক্সিক্ষত ঘটনার প্রতিক্রিয়া মানসিক আঘাত শিশুর পরবর্তী জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে। আবেগজাত সমস্যায় আক্রান্ত করে। শিশুর মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার ভালোবাসা, সান্নিধ্যের কোনো বিকল্প নেই। পরিবারে মাতাকে নির্যাতিত হতে দেখলে শিশু নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিশুর মাতা-পিতার বন্ধুত্বপূর্ণ ও মধুর সম্পর্ক শিশুর মধ্যে পরম সুখ ও নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে। পিতাকে তাই শিশুর মানসিক বিকাশে ভূমিকা রাখতে হবে।' ন্যাশনাল ট্রমা কাউসেলিং সেন্টারের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ইশরাত শারমীন রহমান বলেন, পারিবারিক কলহের মধ্যে বেড়ে ওঠা অথবা মাকে নির্যাতিত হতে দেখা শিশুদের জীবনের প্রথম দিকের বছরগুলোতে তারা হয় বিশেষভাবে অরক্ষিত, অসহায়। শিশুরা এমন ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে যে, অন্যকে আঘাত করা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তাই সে যে কাউকে আঘাত করতে পারে। আবার সেও অন্যের কাছ থেকে আঘাত পেতে পারে। তাই বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তাদের নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

সুসন্তানের মাধ্যমে পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও লাভবান হয়। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আমল বন্ধ হয় না-

১. সদকায়ে জারিয়া

২. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়

৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দো'আ করে"

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্তানদেরকে কবুল করুন, তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন

04

আত্মহত্যার কারণ ও প্রতিকার

আত্মহত্যা' সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত একটি 'শব্দ' এবং 'কাজ'। আত্মহত্যার চেয়ে ভয়ংকর বিব্রতকর এবং কষ্টকর কোনো প্রেক্ষাপট সমাজে আর একটিও নেই। কিন্তু তার পরও ঘটনাটি ঘটে এবং বলা যায় হরহামেশাই ঘটে।

আত্মহত্যা একটি ভয়ংকর অপরাধ ও মানসিক ব্যাধি। ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ। পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়জনিত কারণে স্বাভাবিক মৃত্যুকে না মেনে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেই। মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও মানসিক বেদনা ও অর্থনৈতিক দৈন্যতা বেড়ে গেলে চরম হতাশা কাজ করে। হতাশাই নিজের মধ্যে নেতিবাচক ধারণাগুলো তৈরি করে। এক পর্যায়ে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। একাজ যারা করেন তাদেরকে আত্মঘাতক বা আত্মহনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা নিজেদের হত্যা করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু এবং যে কেউ সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা (আত্মহত্যা) করে, তাকে আগুনে দগ্ধ করব এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' (সুরা আন-নিসা, আয়াত-২৯, ৩০)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে একটি উদ্বেগজনক তথ্য উপস্থাপন করেছে। সেখানে দেখা যায়, পুরো ২০২০ সালটি ছিল কোবিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের বছর। বিশ্বব্যাপী এতো মৃত্যুর মিছিল আর কোনো মহামারীতে দেখেনি কখনো। বি.বি.এস. বলেছে, ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫ হাজার ২ জন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে উক্ত নয় মাসে আত্মহত্যায় মারা গেছেন ১১ হাজার মানুষ। অর্থ্যাৎ করোনার চাইতে আত্মহত্যায় মৃত্যুর হার দ্বিগুণ।

বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য মতে পূর্বের বছর গুলোতেও এই প্রবণতার রূপ ছিল ভয়াবহ। ২০১৮ সালে ১১ হাজারের বেশি মানুষ, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ১১ হাজার ৯৫ জন, ২০১৬ সালে ১০ হাজার ৬০০ জন, ২০১৫ সালে ১০ হাজার ৫০০ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। উক্ত হিসাবকে দৈনিক ভাগ করলে গড়ে প্রতিদিন ৩০ জন মানুষ আত্মহত্যা করছে।

আত্মহত্যা কী?

আত্মহত্যা বা আত্মহনন (ইংরেজি: Suicide) হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। ল্যাটিন ভাষায় *সুই সেইডেয়ার* থেকে আত্মহত্যা শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে নিজে হত্যা করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা কবিরা গুনাহ। শিরকের পর সবচে বড় গুনাহ। ফকিহ ইমামগণের সর্বসম্মত মতে আত্মহত্যা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ যুলুম করে, অন্যায়ভাবে তা (আত্মহত্যা) করবে, অবশ্যই আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ করবো, আল্লাহর পক্ষে তা সহজসাধ্য।' [সুরা নিসা, ৪ : ২৯-৩০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।' [সুরা বাকারা, ২ : ১৯৫]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে।' [বুখারি, *আসসাহিহ*: ৫৭০০; মুসলিম, *আসসাহিহ*: ১১০]

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। সেখানে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে বিষ খাইয়ে মারতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। যে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, তার কাছে জাহান্নামে সে ধারালো অস্ত্র থাকবে, যার দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে। [বুখারি, *আসসাহিহ*: ৫৪৪২; মুসলিম, *আসসাহিহ*: ১০৯]

আত্নহত্যার কারণসমুহঃ

সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য আমি আত্মহত্যার সুনির্দিষ্ট কারণ(causative factor),তাত্বিক কারণ(aetiological factor), বিপদজনক উপাদানগুলোকে(risk factor) একসাথে আলোচনা করলাম-

১. মন খারাপ / ডিপ্রেশন

২. ব্যক্তিত্বের সমস্যা

৩. চাওয়া পাওয়ার তারতম্য

৪. উপার্জন বন্ধ হওয়া,চাকরি চলে যাওয়া

৫. একাকী থাকতে বাধ্য হওয়া

৬. নিজেকে সমাজ থেকে গুটিয়ে রাখা

৭. স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য

৮. যৌতুকের কারণে ঝগড়া বিবাদ

৯. বাবা মা ও ছেলে মেয়ের মাঝে মনোমালিন্য

১০. প্রেম বিরহ

১১. মিথ্যা অভিনয়ের ফাঁদে পড়া

১২. কারো কাছে পরাজয় বরণ করা

১৩. ধন দৌলত আত্বসাৎ হিয়ে ফতুর হওয়া

১৪. পরীক্ষায় ব্যার্থ হওয়া

১৫. জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আত্নবোধ সমপর্কে অবগত না হওয়া

১৬. জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় ও নীতিনৈতিকাপুর্ণ শিক্ষার বাস্তবায়ন না থাকা ইত্যাদি

১৭. উচ্চপদের কর্তা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কর্মজীবী দিনমজুর,ব্যবসায়ীগণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্নহত্যা করে থাকেন

১৮. মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা

১৯. প্রযুক্তির প্রতি অত্যাধিক আসক্তি

২০. মানুষের আস্তা ও বিশ্বাসের জায়গাগুলো দুর্বল হিয়ে গেলে মানুষ অসহায়বোধ করে এবং এক পর্যায়ে আত্নহত্যা করে

২১. খারাপ ফলাফল

২২. ইভটিজিং

২৩. বেকারত্ব

আত্মহত্যার উপকরণের সহজলভ্যতাঃ বাংলাদেশে আত্মহত্যাকারীদের ৬০% এরও বেশী আত্মহত্যা করেন কীটনাশক বা বিষ পানে,ঘুমের ঔষধ খেয়ে এবং মাদক সেবন করে।আইনানুসারে এগুলো সহজলভ্য হওয়ার কথা ছিল না।কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় এবং আমাদের দায়িত্বহীনতা ও অসচেতনতার অভাবে এগুলোর সহজলভ্যতা আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি করছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের সকল দেশের সরকারকে এসব জিনিসের সহজলভ্যতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বহীনতাঃ বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার হলেও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা ও পেশাদারীত্বের অভাবে আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে আত্মহত্যার ঝুঁকিতে থাকা মানুষগুলো আত্মহননে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।এ বিষযে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার "World Suicide Report-2014"এ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।আমি রিপোর্টটির সেই অংশটুকু আপনাদের জ্ঞাতার্থে এখানে উদ্ধৃত করলাম-

আত্মহত্যা প্রবণতার বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিঃ বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ ও হীন কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়।অথচ আত্মহত্যাপ্রবণ ও আত্মহত্যা চেষ্টাকারীরা সবচেয়ে অসহায় মানুষ।নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত কারণে এদের অনেকেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ, চিকিৎসা ও সাপোর্টের অভাবে পরবর্তীতে সফল আত্মহত্যায় মারা যায়।

বিষন্নতাঃ আত্মহত্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিষণ্নতা।বিষণ্নতা এমন একটি ভয়াবহ মানসিক রোগ যে বেঁচে থাকার সকল আগ্রহকে ম্লান করে দেয়।এ রোগে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভূগলেও সচেতনতার অভাবে তা নির্ণিত হচ্ছে না এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও পাচ্ছে না।অনেকে মনে করেন মন খারাপ থাকলেই বুঝি বিষণ্নতা বোঝা যায়।কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য নয়।অনেক বিষণ্নতায় ভোগা রোগীই হাসিমুখে অামাদের মাঝে বাস করে যাকে 'স্মাইলিং ডিপ্রেশন' বলে।তাছাড়া ছোট বাচ্চারাও বিষণ্নতায় ভূগতে পারেন।এ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন। অনিন্দ্য সুন্দরী ও আবেদনময়ী বিখ্যাত হলিউড অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো মাত্র ৩৬ বছর বয়সে বিষণ্নতার চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।সুশান্ত সিং রাজপুতও বিষণ্নতার চিকিৎসা চলাকালীন আত্মহত্যা করেছেন।

সিজোফ্রেনিয়াঃ প্রধান উসর্গসমূহ-অলীক কথা শোনা বা দেখা, ভ্রান্ত দৃঢ় বিশ্বাস, অসংলগ্ন কথাবার্তা, চিন্তার জগতে বিশৃঙ্খলা, ঘুম না হওয়া, কম কথা বলা, সন্দেহ করা, নিজের যত্ন নেওয়ায় উদাসীনতা, মন খারাপ থাকা ইত্যাদি। সিজোফ্রেনিয়ার কোন কোন রোগী আত্মহত্যায় প্ররোচণাকারী কথাবার্তা শুনে থাকে (অডিটরি কমান্ড হ্যালুসিনেশন) এবং সে মোতাবেক আত্মহত্যার প্ল্যান করতে থাকে।এরা এত নিখুঁত প্ল্যান করতে পারে এবং তা এত চমৎকারভাবে গোপন রাখে যে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যায় সফল হয়।

বীভৎস্য অভিজ্ঞতা পরবর্তী মানসিক রোগ (PTSD)- ভয়ংকর কোন ঘটনা দেখার পর কেউ কেউ এ সমস্যায় ভূগে থাকেন।অতিরিক্ত অস্থিরতা ,আতংক, ভয়ে চমকে চমকে উঠা এবং বীভৎস্য ঘটনাটি বার বার চোখের সামনে ভাসতে থাকা বা বার বার সেটা স্বপ্নে দেখা এ সমস্যার প্রধান উপসর্গ।POST TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) বা বীভৎস্য অভিজ্ঞতা পরবর্তী মানসিক চাপে মানুষ এতটাই অস্থিরতায় ভূগতে পারে যে সে আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারে।করোনা রোগির শ্বাসকষ্ট যখন বেশি হয় তখন তার কষ্ট চোখের সামনে দেখা একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।একের পর এক মৃত্যু দেখাও একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।এ কারণে যারা করোনা রোগির চিকিৎসা দিচ্ছেন তারা এ সমস্যায় জড়িয়ে যেতে পারেন।গত সপ্তাহে যুক্তরাস্ট্রে লরনা ব্রিন(৪৯) নামক জরুরি বিভাগে কর্মরত একজন সাহসী লড়াকু ডাক্তার যিনি নিজেও করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি সুস্থতা লাভের পর **আত্মহত্যা করেছেন।**

প্রতিকার

১. স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২. শিক্ষার্থীর আবেগ অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যে জমিয়ে না রেখে অন্যের সাথে শেয়ার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আত্মহত্যাকারীদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনজনদের সাথে শেয়ার করে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে ওই ধরনের মানুষের মনকে অন্যদিকে ধাবিত করতে পারলে বেঁচে যায় একটি জীবন।

৪.সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বঃ – সুইসাইড বা আত্নহত্যা বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে, তাদের বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও সমাজিক অনুষ্টানের মাধ্যম সুইসাইডের ক্ষতিকর বিষয় তুলে ধরতে হবে।

৫. ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিধান অনুসরণঃ-

পবিত্র কোরআনে সুইসাইড বা আত্নহত্যা করা হারাম ঘোষণা দিয়েছে ইসলামী ধর্মীয় মতামত আত্মহত্যার বিরুদ্ধে। কুরআন "নিজেকে খুন করো না বা ধ্বংস করো না" বলে এটা নিষেধ করেছে। হাদিসগুলি স্বতন্ত্রভাবে বলেছে আত্মহত্যা করা বেআইনি এবং মহা পাপ । হিন্দুধর্মে আত্মহত্যাকে ঘৃণা করা হয় এবং সমসাময়িক হিন্দু সমাজে আত্মহত্যাকে অন্যকে হত্যা করার সমান পাপ। প্রতিটি ধর্ম তাই সুইসাইড বা আত্নহত্যা মহা পাপ হিসাবে গণ্য করেছেন। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের বিধান অনুসরণ করা।

৭. আত্মহত্যার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচঃ

বিবাহ, সন্তান ও ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্ক। জোরদার সামাজিক সম্পর্ক। আত্মনিয়ন্ত্রণ ভালো থাকা। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের সম্মানহানির কারণ বা ক্ষতির কারণ হওয়ার ভয়। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চা। পেশায় নিয়োজিত থাকা। ইতিবাচক চিন্তা করা।

৮.আত্মহত্যার চেষ্টাকারীদের করণীয়ঃ- চিকিৎসা নিন। ভালো থাকুন। মানসিক ডাক্তার দেখান। ওষুধ খান। নিয়মিত সাইকোথেরাপি নিন। খুব বেশি সুইসাইড বা আত্নহত্যা দিকে যেতে ইচ্ছা হলে পরিবারের সদস্যদের, বন্ধুদের বলুন। তাঁদের সমর্থন নিন আপনার সমস্যা গুলো তাদের বলুন। ধৈর্য ধরুন। ইতিবাচক চিন্তা করার চেষ্টা করুন।

৯.আত্মহত্যার প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করতে হবে। অভিভাবক ও পরিবার এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের বুঝতে হবে বিষয়টি। তাদের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। আমার সমাজও কিন্তু এখানে অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনকি মওলানা সাহেব খুব ভালো ভূমিকা পালন করতে পারেন। স্কুলের মাস্টার সাহেব, মাতবর সাহেব কিন্তু ভালো ভূমিকা পালন করতে পারেন। এখানে কিন্তু ধর্মীয় বিষয়টিও রয়েছে। প্রায় সব

ধর্মেই কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে আত্মহত্যা মেনে নেওয়া হয়। সুতরাং এটিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হেলথ কেয়ার সার্ভিসটা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কারণ হলো মানসিক রোগ। মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি উন্নত থাকে, যদি জানে এটি একটি মানসিক সমস্যা, তাহলে এটি প্রতিরোধ সম্ভব। এরপর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া। তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আত্মহত্যা করলে একটি পরিবার শেষ হয়ে যায়, আত্মহত্যা দেশের জন্য, মানুষের জন্য কত ক্ষতি, এই প্রভাবটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি, বোঝাতে পারি তাহলে ভালো।

১০.বিষন্নতা রোধে করণীয়ঃ শরীর চর্চার বিষয় একটু বলি। আমরা যদি শরীরচর্চা করি, ব্যায়াম করি, একটু দৌড়াদৌড়ি করি, জগিং করি, তাহলে মস্তিষ্ক একটি রাসায়নিক তৈরি করে। এই রাসায়নিকটার নাম অ্যান্ডোরফিন। অ্যান্ডো মানে ভেতরে। আর মরফিন বের হলে আনন্দ তৈরি হয়। সুখানুভূতি তৈরি হয়। অ্যান্ডোরফিন যদি মস্তিষ্কে তৈরি হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে কিন্তু সুখানুভূতি তৈরি হবে। দশটা রোগ কম হবে, আপনি যদি ব্যায়াম করেন। উচ্চ রক্তচাপ কম হবে, ডায়াবেটিস হবে, আরথ্রাইটিস হবে না, হার্টের রোগ কম হবে। পাশাপাশি মনের ভালো লাগাটাও বাড়বে।

১১.বিষণ্ণতা আত্মহত্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ওষুধ, চিকিৎসক এগুলো বাদ দিলাম। একটি স্লোগান ছিল টক এবাউট ডিপ্রেশন। চলুন, বিষণ্ণতা নিয়ে আমরা কথা বলি। মনেরভাব প্রকাশ করি। আমি যেহেতু অসহায়, একটি আশার পথ দেখি। কোনো পথ পাওয়া যায় কি না। কারো সঙ্গে কথা বলেও তো পথটা পাওয়া যেতে পারে। কারো সঙ্গে কথা বললে হয়তো আপনি সহমর্মিতা পাবেন। কাছের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। কিংবা সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলর সবার কাছে যাওয়া যেতে পারে।

১২. ইভটিজিং বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ

১৩. সন্তানদের ব্যক্তিত্ববান করে গড়ে তোলা

১৪. চাহিদা কমানো

১৫. দীর্ঘ সময় একাকো না কাটানো

১৬. সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করা

১৭. যৌতুক প্রথা বন্ধ করা

১৮. নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ

১৯. জীবনের লক্ষয উদ্দেশ্য আত্নবোধ সমপর্কে সচেতন হওয়া

২০. ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও পালন

২১. জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিকতাপুর্ণ শিক্ষার বাস্তবায়ন

২২. প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

২৩. বেকারত্বের নিরসন

২৪. সরকারিভাবে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান

২৫. আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

05

মাদকের ছোবল ও নেশামুক্ত জীবন

মাদক- এক অভিশাপের নাম, এক সর্বনাশা ছোবলের নাম। এটি এমন এক সামাজিক সমস্যা, যা শুধু অপরাধের জন্ম ও বিকাশ সাধন করে তা-ই নয়, বরং এর বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এটা এমনই এক বিষ, যা ধীরে ধীরে বিবর্ণ করে দিচ্ছে আমাদের সবুজ তারুণ্যকে। নষ্ট করে দিচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ।

এ দেশে রয়েছে পর্যাপ্ত তারুণ্যনির্ভর জনশক্তি। দেশের এ মূল্যবান সম্পদ মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের কবলে পড়ে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি দেশের অর্থনীতিও হচ্ছে বিপর্যস্ত, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। নেশার ছোবলে পড়ে এ যুবসমাজ কর্মশক্তি, সেবার মনোভাব ও সৃজনশীলতা হারিয়ে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করছে তিলে তিলে।

দেশগড়ার কারিগর সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মাদক। মাদকের কারণেই অনেক মা-বাবার বুক ফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে যায়। আর এই মরণ নেশার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামাজিক কাঠামোয়, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে, ভারসাম্যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে- এক কথায় জীবনের সর্বত্র।

মাদক

মাদক এমন একটি দ্রব্য, যা খেলে নেশা হয়। গাঁজা, ফেনসিডিল, চরস, ভাং, গুল, জর্দা, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মদ, ইয়াবাসহ সবই মাদকের অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ এসব দ্রব্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখনই তাকে মাদকাসক্ত বলা হয়। ১৯৮৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকাসক্ত বলতে, শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে বোঝানো হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এভাবে মাদকাসক্তির সংজ্ঞা দিয়েছে— Intoxication is detrimental to the individual and the society produced by the repeated consumption of a drug (Natural and Synthetic.)

এক নজরে বাংলাদেশে মাদকের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন মানুষ মাদকাসক্ত। দেশের বেকার জনসংখ্যারও বেশ বড় অংশ মাদকাসক্ত। মোট মাদকাসক্তদের ৪৮ শতাংশ শিক্ষিত এবং ৪০ শতাংশ অশিক্ষিত। মাদকাসক্তদের প্রায় ৫৭ শতাংশ যৌন অপরাধী, যাদের ৭ শতাংশ হলো এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত। সারা দেশে প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার মাদক ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন, যাঁদের মধ্যে ২৭ হাজার ৩০০ জন মহিলা।

২০১৯ সালে গড়ে প্রতিদিন ১১৪ জন রোগী সরকারি ও বেসরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০৪ এবং ২০১৭ সালে ৬৯। এটাও অবাক করার মতো বিষয় যে ২০১৯ সালে মহিলা মাদকসেবীদের সংখ্যা চার গুণ বেড়েছে। ২০১৮ সালে ৯১ জন মহিলা সরকারি সুযোগ-সুবিধায় চিকিৎসা পেয়েছিলেন। এই সংখ্যা বেড়ে ২০১৯ সালে ৩৬০ হয়েছে। (১৩ জানুয়ারি, ২০২০-এ দ্য ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেসে প্রকাশিত)।

মাদক ব্যবহারকারীরা একাধিক উৎস থেকে মাদক সংগ্রহ করে। তাদের বেশির ভাগকেই বন্ধুবান্ধব-সহপাঠী মাদক সরবরাহ করে। কেউ কেউ মাদক ব্যবসায়ী-চোরাচালানকারীদেরই উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

মাদকের নেশায় আসক্ত হওয়ার পিছনে কারণঃ

মাদকের নেশায় আসক্ত হবার পেছনে যেসব কারণ কাজ করে, তার মধ্যে রয়েছে বন্ধু বান্ধবের কুপ্রভাব, কৌতূহল, মানসিক সমস্যা, পারিবারিক অশান্তি, পরিবারে মাদকের ব্যবহার, সহজলভ্যতা, বেকারত্ব, হতাশা এবং সচেতনতার অভাব।

আবার অনেক সময় অধিকাংশ বাবা-মা-ই খবর রাখেন না যে, তার আদরের সন্তান ঘরের বাইরে কি করে? এমনকি অনেক বাবা-মা ঘরের ভেতরে সন্তান কি করে সে খবরও জানেন না। বাবা-মায়ের এই অসতর্কতার কারণেও অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কমবেশি মাদক সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশেও মাদক ও মাদকাসক্তি এক জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মাদকসেবী কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতী। এই ভয়াল মাদক তারুণ্য, মেধা, বিবেক, লেখাপড়া, মনুষ্যত্ব সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিনষ্ট করে দিচ্ছে স্নেহ-মায়া, ভালবাসা, পারিবারিক বন্ধন।

কয়েক বছর পূর্বে ঢাকার উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার একমাত্র মেয়ে ঐশী মারণঘাতী এই মাদকে আসক্ত হয়ে নিজের বাবা-মাকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। আদরের সন্তানটি শুধু মাদকে আসক্ত হওয়ার কারণেই নিজ সন্তানের হাতে জীবন দিতে হয়েছে এরকম বহু বাবা-মাকে। সচেতনতার পাশাপাশি প্রতিটি স্তরের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই পারে মাদক নামের এই প্রাণঘাতী ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ দিতে।

মাদকাসক্তির কয়েকটি কুফল ঃ

মাদক সেবনের ফলে শারীরিক বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি পরিলক্ষিত হয় এবং চিকিৎসা ব্যয় এই ক্ষেত্রে পরিবারের অর্থনৈতিক এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়, কর্মক্ষম জনশক্তি কমে যায়, শেখার ক্ষমতা এবং কাজের দক্ষতা কমিয়ে দেয়, বিচার-বিবেচনা, ভুল ঠিক বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে যায়, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আবেগ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, মাদক সেবনে বাধা প্রয়োগ করলেই উগ্র আচরণের প্রকাশ ঘটে, মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়, আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয় ইত্যাদি।

১. অতিরিক্ত মাদক ব্যবহার করার ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে যায়। এতে করে খুব সহজেই যেকোনো রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২. শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক নেওয়ার ফলে মানুষের ব্লাড ভেসেল এর কার্যকারিতা কমে যায়। এছাড়া অস্বাভাবিক রক্তচাপের কারণে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে।

৩. শরীরের ওজন কমে যায় এবং মাঝেমধ্যে বুকে ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

৪. স্মৃতিশক্তি কমে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে করে ব্রেইন স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৫. একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের পাকস্থলী সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণে দুর্বল হয়ে যায়। ফলে খাবার হজম করতে না পারায় শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

৬. এছাড়া মাদকের প্রভাবে মানুষের মানসিক বিকৃতি ঘটে। তাদের মধ্যে আচরণের এবং দৃষ্টিভঙ্গির অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। কোনো কাজে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারে না। তাদের মনে হয় পৃথিবীজুড়ে মাদক গ্রহণ ছাড়া সুখের আর কোনো কাজ নেই।

৭. অনেক সময় মাদক পাচারে অথবা গ্রহণে যুক্ত থাকার কারণে মানুষের মধ্যে মারামারি খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়। আর এই মাদকের কারণে এই পৃথিবীর বুকে দিনদিন চুরি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ এর মত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে নিজেকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন:

১. জীবনের লক্ষ্য ঠিক করা।

গবেষণা থেকে বিষয়টি প্রমাণিত যে, যেসব মানুষের জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারিত করা থাকে তারা নিজেকে মাদক থেকে অন্যদের তুলনায় কিছুটা হলেও দূরে রাখতে সক্ষম হয়। এর কারণ এই যে, আপনার লক্ষ্য আপনাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে সবসময় তাড়া প্রদান করে এবং এরফলে আপনি নিজেকে মাদক গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কোনো সুযোগই পান না। যদি আপনি মাদক আসক্ত হয়ে পড়েন তাহলে সেই সময়ের জন্য হয়তো একটু সুখ পাবেন তবে ভবিষ্যৎ জীবনে আপনাকে এর জন্য ভুগতে হবে। লক্ষ্য সম্বলিত মানুষগুলো এই ধরনের চিন্তা চেতনার ফলেই নিজেকে মাদক থেকে দূরে রাখতে পারেন।

২. ভালোবাসার মানুষের সাথে সময় কাটানো

নিজের পরিবার এবং প্রিয় মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক আপনাকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে। যেসব মানুষদের সাথে মেলামেশা করলে আপনার প্রশান্তি অনুভূত হয় তাদের সাথে বেশি করে সময় কাটান। তাহলে ধীরেধীরে নিজের জীবনকে মাদকমুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

৩. অন্যের সাহায্য নেওয়া

কখনও যদি আপনি সম্পূর্ণরূপে মাদক আসক্ত হয়ে পড়েন তাহলে আপনার আশেপাশের মানুষদের সাথে কথা বলুন। আপনার সমস্যা সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত জানান। যাকে জানাবেন সে হতে পারে আপনার বাবা-মা,শিক্ষক অথবা কাউন্সিলর। আপনি হয়তো তাদের কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পেয়ে থাকবেন যা আপনাকে মাদক থেকে দূরে রাখবে।

৪. ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করা

কথায় আছে যে ব্যস্ততা হলো মানুষের জীবনের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আবার আরেকটি কথা আছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। আমরা যদি এই দুইটি প্রবাদ বাক্য কে একসাথে করি তাহলে দেখতে পাব যে, মাদক আসক্ত ব্যক্তিরা বেশিরভাগ সময় অলস ঘোরাফেরা করেন যে কারণে তাদের জীবন থেকে মাদকাসক্তির প্রভাবে শান্তি বিলীন হয়ে পড়ে। তাই মাদককে ভুলে থাকতে হলে নিজেকে ব্যস্ত রাখার বিকল্প কোনো পথ নেই। একের পর এক বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে থাকুন। যদি নিজের কোনো কাজ না থাকে তাহলে সামাজিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। জীবনে শান্তি ফিরে আসার পাশাপাশি হয়তো একটা সময়ে গিয়ে দেখবেন মাদক গ্রহণের কথা একেবারে ভুলে গেছেন।

৫. সঙ্গী পরিবর্তন করা

২০১৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ২৫০ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তির ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের ৮০ শতাংশ ব্যক্তি মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তাই আপনিও যদি আপনার সঙ্গীর খপ্পরে পড়ে মাদক আসক্ত হয়ে পড়েন তাহলে খুব দ্রুত সেই সঙ্গীকে ত্যাগ করুন। কারণ, আমাদের দেশে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে – সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

৬. দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা

নিজেকে কখনও দুর্বল ভাববেন না। আপনি মাদকে জড়িয়ে পড়েছেন তারমানে এই না যে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না। মানুষ চাইলে পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই সেটাকে করতে পারে না। তাই সবসময় পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। একসময় না একসময় গিয়ে সফলতা আপনার কাছে ধরা দেবেই। মাদক থেকে দূরে থাকতে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন এতে করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

৮. শারীরিক পরিশ্রম করা

শারীরিক পরিশ্রম করার সময় এন্ডোরফিন নামক এক ধরনের হরমোন নির্গত হয় যা মানুষের ভেতরে ভালোলাগার সৃষ্টি করে। ঠিক সেই ধরণের ভালো লাগার সৃষ্টি করে যে ভালোলাগা আপনি মাদক গ্রহণ করার সময় পেয়ে থাকেন। এছাড়াও শারীরিক পরিশ্রম আপনার ডিপ্রেশনকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। আর আমরা জানি যে, ডিপ্রেশন মাদক গ্রহণের অন্যতম একটি সহযোগী। তাই শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি নিজেকে মাদক থেকে দূরে রাখতে পারেন।

৯. ক্যাফেইনযুক্ত খাবার থেকে বিরত থাকা

সর্বদা আমাদের ক্যাফেইনযুক্ত খাবার বা কোমল পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ করলে মানুষের ভেতরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যা শেষ পর্যন্ত মাদক গ্রহণে গিয়ে পৌঁছাতে পারে।

১০. পরিমিত ঘুমানো

আপনার শরীরের জন্য অপর্যাপ্ত ঘুম আপনার ভেতরে দুর্দশা,দুঃখ এবং ডিপ্রেশনের সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া কম ঘুমালে মানুষের মস্তিষ্ক ধীরেধীরে বিকৃত হয়ে পড়ে যা মানুষকে মাদক গ্রহণে আরও উৎসাহ যোগায়।

১২. মোটিভেশনাল বক্তব্য শোনা

আপনি যদি নিজেকে কোনোভাবেই মাদক থেকে ফিরিয়ে আনতে না পারেন তাহলে নিজেকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করুন। চাইলে ইন্টারনেট সার্চ করে বিভিন্ন মোটিভেশনাল বক্তব্য শুনতে পারেন যা আপনার মনকে মাদক থেকে মুক্ত রাখতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে, সাময়িক এই সুখের পর এই জীবনে নেমে আসবে দুর্দশা।

১৩. নিজের সম্মানের কথা ভাবা

নিজেকে মোটিভেট করতে সমাজে নিজের মান সম্মানের কথা চিন্তা করুন। যদি আপনি মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েন তাহলে সমাজের মানুষ আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। কেউ আপনার সাথে মিশতে চাইবে না এমনকি আপনার পরিবারের সবাইকে আপনার জন্য সমাজে অপমানিত হতে হবে। অন্তত এসব কথা ভেবে হলেও নিজেকে মাদক থেকে দূরে রাখুন।

১৪. খেলাধুলা করা

বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে মাদক থেকে যুব সমাজকে মুক্ত রাখতে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এবং সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্য একটাই যাতে মাদকে আসক্ত না হয়ে খেলাধুলা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে আসক্ত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে আনন্দ দিতে পারেন।

মাদক বর্তমানে একটি ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মাদকের কারণে সারা পৃথিবীতে চলছে মারামারি খুনাখুনি হানাহানি। মাদকের টাকা না পেয়ে অনেক সময় ছেলে বাবাকে হত্যা করে ফেলে কিংবা বাবা ছেলেকে হত্যা করে ফেলে। তাই,আসুন সবাই মিলে মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সুন্দর একটি সমাজ উপহার দেই।